কাকভুষুণ্ডী তাল

দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাকভুষুণ্ডী তালের টানে ঘর ছাড়লাম ২০০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর। এসে হাজির হলাম গোবিন্দঘাট। কারণ গাইডের জন্য পরিচিত এক বন্ধুর কাছে চিঠি দেওয়া ছিল। আমার বন্ধুটি গাইডের ব্যবস্থা করে দিয়ে বলল, ‘‘দেখো, ও তোমাকে চিরাচরিত পথে নিয়ে যাবে না। ও তোমাকে কাকভুষুণ্ডী তাল পরিক্রমা করাবে। বেশ দুর্গম সেই পথ। কোথাও অসুবিধে হলে সোজা নিচে নেমে আসবে।’’

সেপ্টেম্বর ৪ তারিখে আমাদের যাত্রা শুরু হল। গোবিন্দঘাট থেকে যোশীমঠের দিকে আসার পথে মাঝখানে এক জায়গায় আমরা নেমে পড়লাম। প্রথমদিন আমাদের গন্তব্যস্থল পয়গাঁ হয়ে জবড়ী খড়ক। প্রথম থেকেই বেশ চড়াই পথ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে হাজির হই পয়গাঁ। এখান থেকে বহুদূরে যোশীমঠকে ছবির মতো সুন্দর দেখা যাচ্ছে। হালকা বনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক হাঁটার পর এসে পৌঁছালাম জবড়ী খড়কে। চারিদিকে গভীর বন, একটানা ঝিঁঝিঁপোকার ডাক! গাইড বলে, এই বনের মধ্যেই টেন্টে থাকতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাইড ও তার সঙ্গী দুজন টেন্ট লাগিয়ে ফেলে। বনের পরিবেশ ঠিক তপোভূমির মতো। কতরকমের যে ছত্রাক, ফুল চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তা দেখলে অবাক হতে হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। পরিবেশ আরও নিঝুম হয়ে ওঠে। রাত গভীর হয়। গভীর রাতে শুনতে পাই বন্য পাখির পিলে চমকানো ডাক ও বার্কিং ডিয়ারের চিৎকার।

ভোর হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। সকালে জঙ্গল ভেঙে আমরা যাত্রা শুরু করি। গন্তব্যস্থল দশ হাজার ফুট উঁচু ‘সালধার’। এইদিকে গ্রামবাসীদের সেভাবে চলাচল নেই, তাই পথের কোনও চিহ্ন নেই। শুধুমাত্র আন্দাজ করে এগিয়ে চলতে হয়। কোনও কোনও জায়গায় জঙ্গল এত গভীর যে কুকরির সাহায্যে জঙ্গল কেটে এগোতে হচ্ছিল। আশেপাশে Verbascum Lampas ফুল ফুটে আছে। এই উদ্ভিদের মূল পালমোনারি ইডিমা অসুখের পক্ষে অব্যর্থ।

ঘণ্টাদুয়েক জঙ্গল ভেঙে ওপরদিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি তিনটে লোক ওপর থেকে নেমে আসছে। জিজ্ঞেস করায় তারা বলে যে কাকভুষুণ্ডী তাল দেখে তারা নেমে আসছে। উলটো দিকে ভুইন্দর নালার ওপর কোনও ব্রিজ নেই। তাই তারা একই রাস্তা দিয়ে নামছে। ওদের কথা শুনে একটু দমে গেলাম। তাহলে কি আমাদের কাকভুষুণ্ডী তাল পরিক্রমা হবে না? আমার মনের অবস্থা আঁচ করে গাইড দীপক ও তার সঙ্গীরা অভয় দেয়। বলে, ‘‘চলুন বাবুজী, কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। আমরা নেপালি আছি। ঠিক নালা পেরিয়ে আমরা ভুইন্দর গ্রামে নামব।’’ একটু চিন্তিত মনে চড়াই ভেঙে এগোতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হলাম অপরূপ এক জগতে। এখানে হাজার হাজার রংবেরং-এর ফুল ফুটে রয়েছে। ফুরফুরে হাওয়ায় ফুলগুলো মনের আনন্দে মাথা দোলাচ্ছে। দীপক বলে, ‘‘দেখো বাবুজী, ইয়ে হ্যায় আসলি ফুলোঁ কি ঘাঁটি।’’ মনে মনে ভাবি, সত্যি তো, এ যে ঈশ্বরের উদ্যান। এখানে নেই কোনও মালী, নেই কোনও মালঞ্চের মালাকার। তবুও এখানে নানা রঙের ফুল ফুটে থাকে

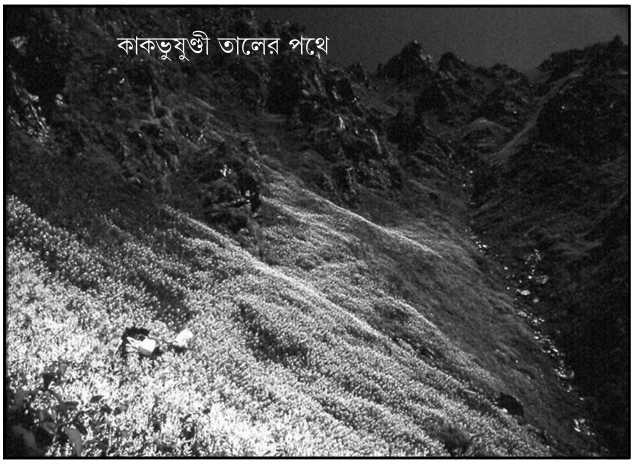

কাকভুষুণ্ডী তালের পথে

হাজারে হাজারে। এক ফুল থেকে আর এক ফুলে প্রজাপতি মনের আনন্দে মধু খেয়ে বেড়ায়। এই অপরূপ জগতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার উঠতে থাকি গন্তব্যস্থলের দিকে। প্রায় একঘণ্টা প্রচণ্ড চড়াই ভেঙে আমরা উঠে এলাম সালধারে। পুরো অঞ্চলটাই ৫০ থেকে ৬০ ডিগ্রি ঢালের মধ্যে অবস্থিত। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে কোনওরকমে দেড়খানা টেন্ট টাঙানোর মতো একটা জায়গা পেলাম। এখান থেকে রাতের যোশীমঠের যে দৃশ্য দেখেছি তা আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পরিবেশ একেবারে নিঝুম। দূরে পাহাড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে আউলি ও গড়সন বুগিয়ালকে।

বিকেলের দিকে দেখি দূরে দুটো ছোটো ছোটো বিন্দুর মতো কী যেন নড়াচড়া করছে। একটু পরে দেখি ওপর থেকে দুজন সাধু নিচে নেমে আসছেন। ওঁরা কাকভুষুণ্ডী তালের রাস্তা খুঁজে না পেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন। আমরা যাচ্ছি শুনে আমাদের সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দেখি ওঁদের সঙ্গে শুধুমাত্র লোটা-কম্বল ও একটা পলিথিনের শিট ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের টেন্টে দুজনের বেশি থাকার জায়গা হবে না। ওঁরা বলেন, পলিথিন শিট ঢাকা দিয়ে সারারাত বাইরে কাটাবেন। অবাক হই ওঁদের সহ্যক্ষমতা দেখে। মনে মনে ভাবি হিমালয়ের সাধুদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা এতকাল শুনেছি, এখন দেখার সুযোগ হল।

পরদিন ভোরবেলা আমাদের যাত্রা শুরু হল। গন্তব্যস্থল পঞ্চবিনায়ক হয়ে বামাইখাল। শেষবারের মতো পিছনে ফেলে আসা যোশীমঠকে দেখে নিলাম। সাধুরা পিছনে পিছনে আসছেন। দূরে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দ্রোণগিরিকে। হঠাৎ পাহাড়ের বাঁক ঘুরে একেবারে থমকে দাঁড়ালাম। আর যাবার রাস্তা কোথাও নেই। সাধুরা বললেন ওঁরাও এখান থেকেই ফিরে গিয়েছিলেন। সামনে দেখি ষাট থেকে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি পাহাড়ের ঢালে হাজার হাজার রডোডেনড্রন গাছের জঙ্গল। গাইড দূরের এক পাহাড়ের মাথা দেখিয়ে বলে, “ওই দেখুন পঞ্চবিনায়ক। এই পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গাছ ধরে ধরে এগোতে হবে।” বেশ দমে গেলাম। কারণ জঙ্গল এতই ঘন যে সোজা করে শরীরটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও বেশ শক্ত। যাই হোক, গাছ ধরে ধরে ধীর পদক্ষেপে এগোচ্ছি। মাঝে মাঝে এমন জায়গা দিয়ে যাচ্ছি যে, যদি কোনও কারণে একটা গাছের ডাল ভেঙে যায়, তাহলে একদম তিনশো ফুট নিচে পড়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। সবুজের মধ্য দিয়ে হাঁটাও যে কত রোমাঞ্চকর হতে পারে তারও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল।

গাছ ধরে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর হাজির হলাম এক ফুলের সমুদ্রে। এখানে হাজার হাজার পারসিকারিয়া পলিস্টাচিয়া ফুল ফুটে রয়েছে। এক জায়গায় এত ফুল ফুটে আছে যে দূর থেকে পাহাড়ের গায়ে সাদা রং করা আছে বলে মনে হচ্ছিল। এখানে কোনও মানুষের আনাগোনা নেই, তাই ফুলেরা ফুটে আছে মনের আনন্দে। বেশ জোর হাওয়া বইছে। ফুলের সমুদ্রে যেন ঢেউ ওঠে। চুপ করে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াই। রবীন্দ্রনাথের মালকোষ রাগের ওপর ‘আনন্দধারা বহিছে ভুবনে’ গানটির মর্মার্থ নতুন করে উপলব্ধি করলাম। এই জায়গাটির নাম গিলানি ওডিয়ার।

ফুলের সমুদ্রে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলাম তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় পঞ্চবিনায়কে। সামনে মেঘে ঢাকা

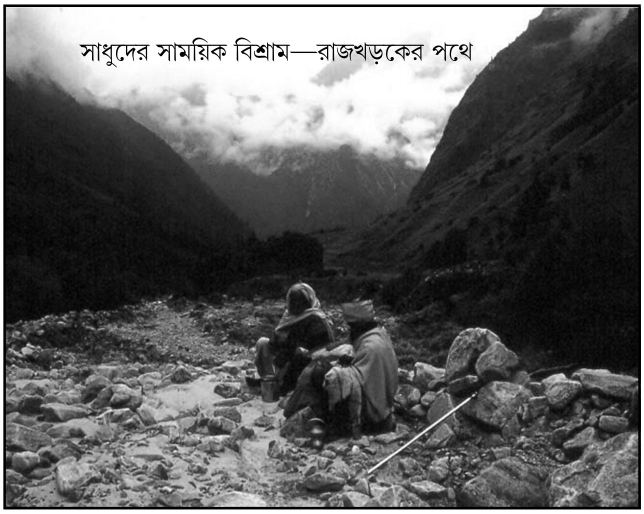

সাধুদের সাময়িক বিশ্রাম—রাজখড়কের পথে

হাতি ও ঘোড়ী পর্বত দেখতে পাচ্ছি। বাঁদিক বদরীনারায়ণের দিক। পিছনে কল্পেশ্বরের দিক। শরতের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ মনের আনন্দে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা। আশেপাশে অসংখ্য ব্রহ্মকমল ফুটে আছে। আমাদের এখান থেকে ডানদিকের পাহাড়ের 'রিজ' অর্থাৎ শৈলশিরা ধরে এগিয়ে যেতে হবে ষোলো হাজার ফুট উচ্চতায় লোয়ার বামাইখালের দিকে। পঞ্চবিনায়কে এসে পোর্টাররা ছবি তুলতে আরম্ভ করে। ওদের সঙ্গে ক্যামেরা দেখে অবাক হই। ওরা বলে, কখনও এদিকে আসেনি, তাই ক্যামেরা এনেছে। রাস্তাটাও ভালো করে চিনে নিয়ে যাবে যাতে ভবিষ্যতে ওরা এই অঞ্চলে গাইডের কাজ করতে পারে। এছাড়া এদের আরও একটা স্বার্থ আছে। এই অঞ্চলে প্রচুর জড়িবুটি পাওয়া যায়। সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারলে প্রচুর দাম পাবে। রিজ ধরে এগোতে শুরু করলাম বামাইখালের দিকে। এখান থেকে বামাইখাল যেতে তিনঘণ্টা লাগবে। যত এগোচ্ছি ততই দেখছি ব্রহ্মকমলের আধিক্য। কোনও কোনও জায়গায় হাজার হাজার এই মহার্ঘ ফুল ফুটে রয়েছে। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর এক জায়গায় এসে গাইড থমকে দাঁড়াল। রাস্তাটা ঠিক চিনতে পারছে না। আমাকে বসিয়ে রেখে ও রাস্তা খুঁজতে গেল। চুপচাপ বসে আছি সেই অমৃতলোকে। আকাশে সাদা সাদা মেঘ যেন ময়ূরপঙ্খী ভেলার সারি। অদূরে হাতি ও ঘোড়ী পর্বত আরও স্পষ্ট হয়েছে। মৃদুমন্দ বাতাসে হাজার হাজার ব্রহ্মকমল মাথা দোলাচ্ছে। পরিবেশ এতটাই চুপচাপ যে একটা পিন পড়লেও আওয়াজ পাওয়া যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ পর গাইড এসে বলল যে রাস্তা পাওয়া গেছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। পোর্টারদের দিয়ে ও টেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছে। বামাইখালে টেন্ট খাটিয়ে ওরা অপেক্ষা করবে। সাধুরা পোর্টারদের সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। আমি ও দীপক রিজ ধরে সেই ঈশ্বরের উদ্যানের ভেতর দিয়ে চলতে থাকি। তাড়াহুড়ো কিছু নেই। আকাশ একদম পরিষ্কার। হঠাৎ ওপর থেকে বেশ কিছুটা নিচে দেখা যায় লোয়ার বামাইখাল অঞ্চলটিকে। সবুজ একখণ্ড জমির ওপর টুকটুকে লাল টেন্ট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পাশে পিঁপড়ের মতো সাধু ও পোর্টারদের নড়াচড়া করতে দেখছি। ধীরে ধীরে ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে এসে হাজির হই লোয়ার বামাইখালে। এই উচ্চতায় সবুজ প্রান্তর আমায় মুগ্ধ করে। চারপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে জলের ধারা। তার কুলুকুলু আওয়াজ, জলতরঙ্গের সুর যেন অন্য জগতে নিয়ে যায়। অঞ্চলটির চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। দীপক বলে, "মাস্টারজী, কাল ওই পাহাড়ের মাথায় চড়তে হবে। তারপর নামা।" পোর্টাররা রান্না শুরু করে দিয়েছে। সাধুরা চানা বার করে খাচ্ছেন। আমিও লোয়ার বামাইখালের এদিক ওদিক ঘুরতে শুরু করি। পাহাড়ের খাঁজে অসংখ্য পোলাইগোনাম ফুল ফুটে আছে। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ব্রহ্মকমল। পাথরের ওপর গিয়ে বসি। ফুলগুলো বহুদিন বাদে সঙ্গী দেখে যেন মনের আনন্দে মাথা দোলাচ্ছে। সামান্য দূরে পাহাড়ের ঢালে দেখি লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মকমল! অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। আগামী কাল আপার বামাইখাল হয়ে কাকভুষুণ্ডী তাল পৌঁছাব, এটা ভেবেই মনটা আনন্দে নেচে উঠছে। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। বেশ ঠাণ্ডা। আমরা তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ি। সাধুদের বলি তাঁবুর মধ্যে আসার জন্য। ওঁরা রাজি হন না। ওই

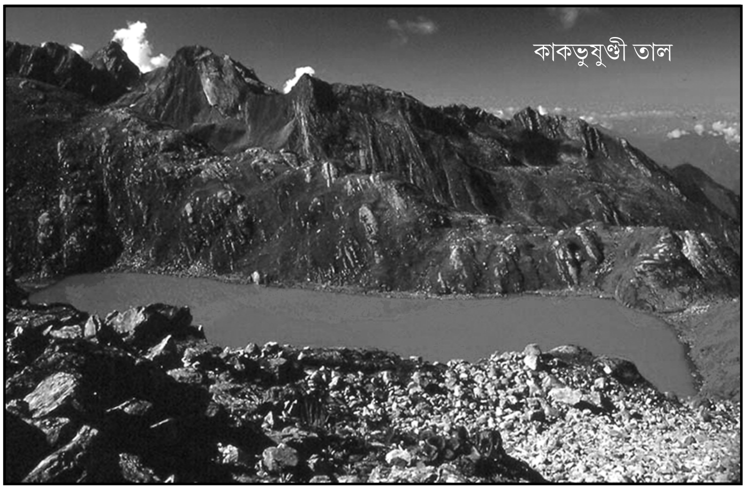

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পলিথিন শিট ও কম্বল জড়িয়ে তাঁবুর বাইরে সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েন। স্তম্ভিত হয়ে যাই ওঁদের সহ্য করার ক্ষমতা দেখে। এ যেন দেবাদিদেব শিবের পদতলে নিজেকে সঁপে দেওয়া।

পরদিন সকালবেলায় উঠে দেখি সাধুরা প্রস্তুত। ওঁদের মুখমণ্ডলে কীরকম একটা স্বর্গীয় ভাব। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঘাসের ডগায় শিশিরের বিন্দুগুলো জমে বরফ হয়ে গেছে। আমাদের যাত্রা শুরু হল। সাধুরা এগিয়ে চলেছেন। পায়ের চটিগুলো ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু ওঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছু একটা পাওয়ার তাগিদে যেন নতুন উদ্যমে চলেছেন। আমাদের গন্তব্যস্থল আপার বামাইখাল হয়ে কাকভুষুণ্ডী তালের (ষোলো হাজার ফুট) ধারে প্রবেশ করা। প্রথম থেকেই দমফাটা চড়াই। প্রচণ্ড হাঁফ ধরছে। সাধুরা কম্বল কাঁধে নিয়ে শুধু কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিলেন। শুধুই উঠে চলা। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে একসময় উঠে যাই আপার বামাইখাল অঞ্চলে। এখানে ব্রহ্মকমলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শয়ে শয়ে ফেনকমল, মেকানপ্‌সিস অ্যাকুলিয়েটা। বেশ কাছে হাতি ও ঘোড়ী পর্বত। আমাদের মনে হল আমরা যেন একটা ছাদের ওপর বসে আছি। গাইড দেখায় এগিয়ে যাবার রাস্তা। আমাদের একদম নিচের দিকে নামতে হবে। তারপর অন্তত দুশো ফুট চড়াই ভাঙতে হবে। দীপকের কথা শুনে তো সাধুদের থমকে যাওয়ার অবস্থা। একজন সাধুর পা কেটে রক্ত ঝরছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর আমরা যাত্রা শুরু করলাম কাকভুষণ্ডী তালের উদ্দেশে।

আপার বামাইখাল থেকে আমরা নিচে নেমে চলেছি। মনে হল, আমরা যেন ছাদ থেকে সোজাসুজি নিচে নামছি। এইভাবে আধঘণ্টা ধরে নামার পর হাজির হলাম একটি scree zone-এ।* এখনও তালটাকে দেখতে পাচ্ছি না। গাইড বেশ বিভ্রান্ত। অবশেষে ঠিক হল সামনের প্রায় ষাট ডিগ্রির ঢাল ধরে ওপরে উঠে দেখতে হবে ওপারে কী আছে। দমফাটা চড়াই ভেঙে এগোচ্ছি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে চার হাত-পায়ের সাহায্য নিতে হচ্ছে। সঙ্গী সাধু দুজন অসম্ভব পরিশ্রম করে প্রসন্নমুখে উঠে চলেছেন। এভাবে প্রায় দুশো ফুট চড়াই ভাঙার পর আমাদের বাক্‌রুদ্ধ হবার অবস্থা। ঠিক সামনেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত কাকভুষুণ্ডী তাল। পান্নাসবুজ জলের রঙ। সাধুরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠে বসে তাঁরা কাকভুষুণ্ডীর কাহিনি বলতে লাগলেন।

শিবজী শ্রীরামচন্দ্রের মহিমার কথা দুজনকে বলেছিলেন, একজন তাঁর স্ত্রী দেবী পার্বতী, দ্বিতীয়জন পরমভক্ত কাকভুষুণ্ডী। পূর্বজন্মে তিনি অযোধ্যা নগরে এক শূদ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরজন্মে তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মান এবং শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে ওঠেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেইসময় লোমশ মুনির সঙ্গে তিনি তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে লোমশ মুনি কাকভুষুণ্ডীকে অভিশাপ দিয়ে কাকে রূপান্তরিত করে দেন। কাক হয়ে উড়তে উড়তে তিনি চলে গেলেন হিমালয়ের গভীর অন্তঃপুরে। সেখানে এক অপরূপ তালের ধারে থাকতে লাগলেন। মুনি কাকে রূপান্তরিত হলেও গলার স্বরে কোনও পরিবর্তন হল না। তিনি

* পাহাড়ের ঢাল থেকে শিলাংশের স্খলনে উৎপন্ন শিলাখণ্ডগুলিকে সামগ্রিকভাবে scree বলে।

ওই তালে স্নান করে নিত্য শোনাতে লাগলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাখ্যান। প্রথমদিকে পরিযায়ী পাখিরা শুনতে আসত। পরের দিকে আসতে আরম্ভ করলেন হিমালয়ের সন্ন্যাসীরা। এদিকে স্বর্গের দেবতারা দেখলেন—তাই তো, তালের ধারে এত জটলা কীসের? তাঁরা এসে দেখেন একটি কাক সুললিত কণ্ঠে শোনাচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের উপাখ্যান। আর শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছে। দেবতারাও তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কাকভুষুণ্ডী যেহেতু ওই তালের ধারে বসে উপাখ্যান শোনাতেন, তাই তাঁর নাম অনুসারে তালের নাম হয় কাকভুষুণ্ডী তাল।

কাকভুষুণ্ডী তালের ধারে এসে আমাদের সঙ্গী সাধুরা ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। পরম প্রাপ্তির আনন্দ ওঁদের চোখেমুখে। তালের আশে পাশে ফুটে আছে হাজার হাজার ব্রহ্মকমল, ফেনকমল। বিকেল হয়ে আসে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে। সেই পড়ন্ত সূর্যের রক্তিমাভায় তালের জল অপরূপ রূপ ধারণ করেছে। মনে হল পৃথিবীর কোথাও যদি স্বর্গ থাকে তবে আছে এই কাকভুষুণ্ডী তালের ধারেই। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস এই তালের আশপাশ অত্যন্ত পবিত্র। তাই একটু দূরে টেন্ট খাটানো হয়েছে। তালের চারপাশে ওরা খালি পায়ে ঘোরাফেরা করছে। তালটা সুউচ্চ পাহাড় দিয়ে ঘেরা, একফালি কাস্তের মতো দেখতে। তালের ধারে এসে বসি। ফুরফুর করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সেই মৃদুমন্দ বাতাসে তালের জল তির তির করে কাঁপছে। গাইড আগামী কালের কুনকুন খাল যাবার রাস্তা দেখায়। তালের অপর পাড় দিয়ে রাস্তা সোজা ওপরে উঠে গেছে। সন্ধ্যা নামে। সাধুরা তালের ধারে একটা ছোটো গুহায় রাত কাটাতে চলে যান। রাতে দূর থেকে শুনতে পাই ওঁদের মন্ত্রোচ্চারণের সুমধুর আওয়াজ। সত্যি কথা বলতে কী, এই সাধুসঙ্গ আমার ভ্রমণকে একটা অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে।

পরদিন ভোরে সূর্যালোক এসে পড়ে তালের জলে। তখন জলের রং আবার অন্যরকম। কাছে পাহাড়ের মাথায় সোনালি সূর্যের রং পরিবেশকে আরও মোহময়ী করে তোলে। সকালেই সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতে সাধুরা তালের জলে স্নান করে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। আমরাও যাত্রা শুরু করি কুনকুন খালের (১৬,৯০০ ফুট) উদ্দেশে। আজ আমাদের গন্তব্য কুনকুন খাল হয়ে রাজখড়ক। প্রথম থেকেই বেশ চড়াই। বড়ো বড়ো বোল্ডার চারদিকে। সেই বোল্ডার জোন পেরিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো দেখে নিই কাকভুষুণ্ডী তালকে। হঠাৎ মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। তখনই বুঝতে পারি, একদিনেই তালটাকে আমি কতটা ভালোবেসে ফেলেছিলাম। শেষপর্যন্ত কঠিন চড়াই ভেঙে হাজির হই কুনকুন খালে। এখানে হাতি ও ঘোড়ী পর্বত একদম নাগালের মধ্যে। এতটাই কাছে যে এখানে বসে ওদের হৃৎস্পন্দন যেন আমরা অনুভব করতে পারছি। এখান থেকে গর্জের ভিতর দিয়ে আমাদের নামতে হবে রাজখড়কের দিকে। নেমে যাওয়ার রাস্তাটা খুবই ঢালু, আমরা তাই গ্লিসেড* করে নামতে আরম্ভ করি। প্রায় ঘণ্টাতিনেক বাদে কাকভুষুণ্ডী নালা পেরিয়ে হাজির হই রাজখড়কে। খুব সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। অদূরে হাতি পর্বত থেকে নেমে আসা রাজখড়ক গ্লেসিয়ার। পিছন ফিরে তাকাই। ভাবি কোথা থেকে কোথায় এলাম। অবচেতন মনে এখনও শুনতে পাচ্ছি কাকভুষুণ্ডী তালের জলের আওয়াজ।

পরের দিন ভোরবেলায় আমরা যাত্রা শুরু করি সীমারতোলি হয়ে ভুইন্দর গ্রামের দিকে। কিছুদূর গিয়েই পাই রাজখড়ক গ্লেসিয়ারকে। অনেকটা গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের মতো। সেই গ্লেসিয়ার পেরিয়ে নেমে চলেছি সীমারতোলির দিকে। আকাশ বেশ মেঘাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। ঢুকে পড়লাম সীমারতোলির গভীর জঙ্গলে। এই জঙ্গলে ভাল্লুকের খুবই উপদ্রব। রাস্তা বলে কিছু নেই। কোনওরকমে আন্দাজ করে এগিয়ে চলা। আশেপাশে প্রচুর ভেড়ার মাথার খুলি পড়ে আছে। দীপককে জিজ্ঞাসা করলে ও বলে যে, দুবছর আগে এখানে বকরিওয়ালাদের ভেড়ার পালে সাংঘাতিক মড়ক লাগে ও কয়েক হাজার ভেড়া মারা যায়। এ তারই নিদর্শন। তারপর থেকে এখানে কোনও বকরিওয়ালা আসে না।

* পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে বসে পিছলে নেমে আসার কৌশলকে ‘গ্লিসেড’ বলা হয়।

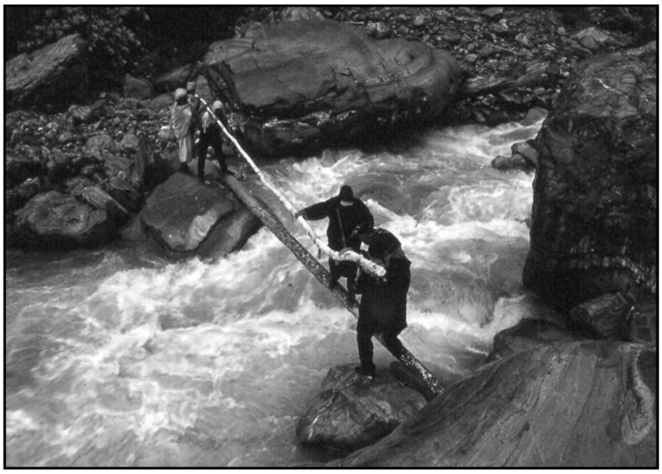

খরস্রোতা ভুইন্দর নালা পেরোনো

তাই এই অঞ্চল এত দুর্গম হয়ে আছে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাধুদের দিকে তাকিয়ে খুবই কষ্ট হল। ওঁদের কাপড়গুলো ছিঁড়ে গেছে। পায়ে চটি নেই। রক্তাক্ত খালি পায়ে হাঁটছেন। ঘণ্টাতিনেক ধরে জঙ্গল ভেদ করে হাঁটার পর আমরা এসে হাজির হলাম ভুইন্দর নালার ধারে। এই নালাকে দুবার পেরোতে হবে। ভয়ংকর খরস্রোতা এই নালা। ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল দীপক। বিকেল হয়ে আসছে। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভুইন্দর নালার গর্জন। অবশেষে ঠিক হয় লগ ব্রিজ তৈরি করতে হবে। ওরা গাছের গুঁড়ি খুঁজতে বের হল। আমরাও চিন্তিত মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সাধু দুজন ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছেন। কিছুক্ষণ বাদে দীপক ও তার সঙ্গীরা একটা বিরাট গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ করে নিয়ে এল। এরপর গাছের গুঁড়িটাকে নালার ওপর লাগাবার প্রাণপণ চেষ্টা। একবার লাগাবার চেষ্টা করে, পরক্ষণেই নদীর স্রোতে সেটা ভেসে যায়। নানাভাবে কসরত করার পর নালার অপর পাড়ে একটা পাথরের খাঁজে গুঁড়িটাকে আটকে লগ ব্রিজ তৈরি করা হল। এরপর আমাদের বলা হল সেই গাছের গুঁড়ির ওপর ব্যালান্স করে পেরিয়ে যেতে। কিন্তু প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া নালা এইভাবে পার হওয়া অসম্ভব বুঝে আবার একটা ছোটো রডোড্রেনড্রন গাছ কেটে রেলিং তৈরি করা হল এবং সেই অপলকা রেলিং কোনওরকমে ধরে একে একে সবাই নালাটি পেরিয়ে এলাম। এইভাবে দুবার প্রচণ্ড খরস্রোতা ভুইন্দর নালা পেরিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত মনে ভুইন্দর গ্রামের দিকে এগিয়ে চললাম। এখন বুঝতে পারলাম কেন প্রথম দিনের দেখা তিনজন গাড়োয়ালি এই রাস্তা দিয়ে না এসে ওদিক দিয়েই নেমে গেছে। মর্মে মর্মে বুঝলাম কেন কাকভুষুণ্ডী তালকে এত দুর্গম ভাবা হয়, কেন এটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত। আমরা যখন ভুইন্দর গ্রামে এলাম গ্রামের লোকজন আমাদের দেখতে এসেছিল। গ্রামের লোকেরা আমাদের জিজ্ঞাসা করল কারা কারা গিয়েছিল। আমরা সকলের কথা বলে সাধুদের খুঁজতে গিয়ে দেখি তাঁরা নেই। আমাদের না বলে চলে গেলেন! গাইড পোর্টারদের জিজ্ঞেস করলে তারাও পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

পরদিন এখান থেকে চিরাচরিত পথে নেমে চললাম গোবিন্দঘাটের দিকে। পথে হেমকুণ্ড সাহিব তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা। শরতের শেষদিক। হেমন্তের আগমনী বার্তা দিকে দিকে। নীল আকাশের বুকে সাদা সাদা মেঘগুলোর ইতস্তত পাদচারণা। অনেক দূরে দেখতে পাচ্ছি পুঁনগাঁও। নিশ্চিন্ত মনে নেমে চলা। পাশে ভুইন্দর গঙ্গার কলকাকলি। শুনতে পাই শুকনো পাতা ঝরার মিষ্টি আওয়াজ। হাঁটতে হাঁটতে মনে হল : ‘‘আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে/ জনশূন্য ক্ষেত্র মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে/ শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার/ রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার/ স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা/ নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা/ বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত/ মুদ্রিত নয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত,/ নিদ্রায় অলস, ক্লান্ত।’’

পেছনে পড়ে রইল মায়াবী কাকভুষুণ্ডী তাল। যার টানে, যে অমৃতকুম্ভের সন্ধানে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় পর্বত পথযাত্রীরা কদাচিৎ ছুটে চলেন হিমালয়ের অন্দরমহলে।